যা আমাদের পড়তে দেয়নি

(২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়া লেখাগুলো)

যা আমাদের পড়তে দেয়নি

(২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়া লেখাগুলো)

বাংলার মানুষের হাজার বছরের সংস্কৃতি-ইতিহাস আর সম্প্রীতি কর্তৃক অনুমোদিত

যা আমাদের পড়তে দেয়নি

প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
সম্পাদনায়	সমুদ্র সৈকত
সহযোগীতায়	মারুফ রসূল ইব্রাহিম খলিল সবাক নাহিদা নিশি শোভন মজুমদার রাকেশ মন্ডল
প্রচ্ছদ	রাজীব দত্ত
মুদ্রণ	নাজিব প্রিন্টিং এন্ড ডাই কাটিং ৪৪, কমর উদ্দিন লেইন (নিচতলা), ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বইটি শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পুর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

প্রসঙ্গ-কথা

"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ"

২০১৭ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত কয়েকটি পাঠ্যবই হাতে পাওয়ার পর অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, এসব বই থেকে প্রগতিশীল ও ভিন্নচিন্তার কয়েকজন লেখকের লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে জানা গেলো, মৌলবাদী সংগঠন হেফাজতে ইসলামের দাবীর প্রেক্ষিতে পাঠ্যবইয়ে এই পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী হেফাজতে ইসলামের এই অযৌক্তিক পরিবর্তনের দাবীগুলো মেনে নিয়ে পাঠ্যবইয়ে যে সাম্প্রদায়িকীকরন হলো, তা তীব্রভাবে নিন্দনীয়। আর, যে প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবইয়ে এই পরিবর্তনগুলো করা হলো, তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী এবং আত্মঘাতী।

আমি মনে করি, পাঠ্যবই হওয়া উচিত সার্বজনীন এবং পরমতসহিষ্ণু চেতনার। বইগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেনো সহনশীল ও মানবিক হয় এবং ভিন্নমত ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, পাঠ্যবই প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ যদি শিক্ষার্থীদের মনে এভাবে বপন করা হতে থাকে, তাহলে দিনশেষে আমাদের সব শুভচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করলেই আমার মনে ভেসে ওঠে আমার আড়াই বছর বয়সী ভাগ্নে কিঞ্জল-এর মুখ। বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কিঞ্জলের মতো শিশুরাও আগামীতে আমাদের পাঠ্যবই পড়ে অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বপ্নের বাঙলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা। শুধু, আমরা যেনো ওদের 'মানবিক মানুষ' হবার পথটা বন্ধ করে না দেই।

পাঠ্যবই থেকে ২০১৭ সালে বাদ দেওয়া লেখাগুলো নিয়ে এই সংকলন- ''যা আমাদের পড়তে দেয়নি''। আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা হরেন্দ্র নাথ মন্ডল-এর পরিকল্পনায়ই এই সংকলনটি করা। অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা মারুফ রসূল-এর প্রতি, যার আন্তরিক সহযোগীতা ছাড়া এই সংকলনটির কাজ শেষ করা কঠিন হতো। বিভিন্নভাবে এই উদ্যোগের পাশে থাকার জন্য ইব্রাহিম খলিল সবাক, নাহিদা নিশি, শোভন মজুমদার, রাকেশ মন্ডল'সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। এই বইটি পড়ে একজন মানুষও যদি কিছুটা চিন্তাশীল হয় এবং মেধা ও মনন দিয়ে বৈচিত্র্যতার সৌন্দর্য অনুভব করে, তবে সেটাই হবে আমার সার্থকতা।

সমুদ্র সৈকত
১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
somudro@outlook.com

সূচিপত্র

কবিতা		
বই **হুমায়ুন আজাদ**	৬	পঞ্চম
প্রার্থনা **গোলাম মোস্তফা**	৭	
সভা **সানাউল হক**	৮	ষষ্ঠ
বাংলাদেশের হৃদয় **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**	১০	সপ্তম
দেশ **জসীমউদ্‌দীন**	১১	অষ্টম
আমার সন্তান **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর**	১২	নবম-দশম
সুখের লাগিয়া **জ্ঞানদাস**	১৪	
সময় গেলে সাধন হবে না **লালন শাহ**	১৫	
স্বাধীনতা **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**	১৬	
সাঁকোটা দুলছে **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**	১৭	
খতিয়ান **রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ**	১৯	

গল্প ও প্রবন্ধ		
লাল গরুটা **সত্যেন সেন**	২০	ষষ্ঠ
রাঁচি ভ্রমণ **এস. ওয়াজেদ আলি**	২৪	
মাল্যদান **রণেশ দাশগুপ্ত**	২৮	সপ্তম
বাঙালির বাংলা **কাজী নজরুল ইসলাম**	৩১	অষ্টম
পালামৌ **সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**	৩৪	নবম-দশম

বই

হুমায়ুন আজাদ

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

যে-বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
সে-বই তুমি পড়বে।

যে-বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
সে-বই তুমি পড়বে।
যে-বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোনো বই-ই নয়
সে-বই তুমি পড়বে না।

যে-বই তোমায় অন্ধ করে
যে-বই তোমায় বন্ধ করে
সে-বই তুমি ধরবে না।

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।

দ্যুলোক-ভূলোক সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদের কখনও
করো না সে পথগামী।

সভা

সানাউল হক

পাড়ার যত কাক কবুতর ঘুঘু শালিক টিয়ে,
মিটিং বসায় জটলা করে সদরঘাটে গিয়ে।
কিচিরমিচির লঘুগুরু নানান রকম স্বর,
পড়শি বলে, 'পালাই পালাই দুয়ার বন্ধ কর'।

মোরগ ব্যাটা জানলা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে এসে–
এবার বুঝি মুক্তি এলো বহু জবাইর শেষে।
পাতিহাঁসের বুদ্ধি দেখ মাইরি সবের খাসা
দেখলে হেঁকে বেরোয় কিনা বিলের আদিম ভাষা।
কাকাতুয়া খাঁচায় বসে পাখনা ঝেড়ে দেখে
ছাড়া পেলে ছুটবে কেমন এরোপ্লেনের বেগে।
ভিড়ের মধ্যে টুনটুনিটি ঢুকতে নাহি পারে
উঁচু গাছের ডগায় বসে অধীর পুচ্ছ নাড়ে।

যেই-না শুরু হবার কথা পক্ষীসভার কাজ
ভিড়ের মধ্যে এসে হাজির চিল শকুনি বাজ।
সবের ধমক, 'চুপটি করো থামাও চেঁচামেচি'
কেউ মেনো না কারোর বচন ক্ষুব্ধ পেঁচাপেঁচি।

সভাপতি কেইবা হবেন বক্তা হবেন কারা
এই-না নিয়ে পক্ষীসভার নেতারা দিশাহারা
'শকুন বুড়ো এই যে হেথায় দেখতে নাহি পাও?'
রুক্ষভাষী বাজের ধমক, 'চোখের মাথা খাও।'

সমর্থনে শিঙে বাজায় সুযোগ-খোঁজা চিল–
হুজুগি সব কাঁকড়া চেঁচায়, 'যুক্তি অনাবিল।'
এমন সময় চোখটি মেলে বলেন পেঁচা, 'উহু'
সভায় পড়ে ধন্যি কোকিল ডাকে কুহু কুহু!
শকুন শাসায়, 'শেষ বয়সে শরম ছিল বাকি,
মুখের ওপর বলবে কথা ছোট জাতের পাখি!'

ফুড়ুৎ করে ফিঙে তখন চিলকে করে তাড়া
বাজপাখি কয়, 'আঁচড়ে দেব একটুখানি দাঁড়া।'
শালিকগুলো একজোটে সব কোমর বেঁধে বলে,
'সভার থেকে চল্ বেটাদের পাঠাই রসাতলে।'
সুবোধ সুজন ঘুঘু টিয়ে প্রাণটি নিয়ে ছোটে,
কাজ কি জেনে কার কী হলো, জিতল কারা ভোটে!
শকুন বুড়ো রেগেমেগে ধুলোয় ঝাড়ল পাখা–
ছোটলোকের বিশ্রী ভিড়ে যায় নাকো আর থাকা।

নতুন করে সভার শুরু, কথা পাড়েন পেঁচা–
রসিকতায় চড়ুই বলে, 'খাবেন একটু চা।'
মুচকি হেসে পেঁচক বলেন, 'ফাজলেমিটা রাখো।
উদ্বোধনী গানের জন্যে কোকিল কোথা ডাকো।'

গানের শেষে বক্তা যত এক এক এসে এসে
পাখিজাতের দুঃখ কথা বলে তুখোড় ঠেসে,
সবের শেষে সভার গুরু চশমা খুলে কয়,
'হুজুগিদের জন্যে বাপু মুক্তি সহজ নয়।'

'ব্যাধশিকারির চেয়ে আরো হিংস্র যে-সব পাখি
স্বার্থপর সে হিংসুটেরা লিডার হবে নাকি?
নিজেরা যারা মাংসভোজী নখে যাদের ধার
বলো তোমরা তাদের হুকুম মানবে নাকি আর?'

'না-না-না'র তুমুল কোরাস মঞ্চ কাকলিময়
কাকের মুখে চড়া স্লোগান, 'পাখি জাতের জয়।'
পুচ্ছ নেড়ে চিমটি কেটে যেই ফিঙে বলে, 'কা'–
রাগে তখন কাকদলীদের তাই রিরি করে গা।

পেঁচা বলেন 'সবুর' থামো ঝগড়া এখন ছাড়ো
বিভেদ-নীতির বিষম পন্থা বিপদ বাড়ায় আরো।
'একজোট ঠিক আমরা যদি দাঁড়াই সবে রুখে,–
সাধ্য কি কেউ আমাদের তিরটি ছোঁড়ে বুকে।'
মুহুর্মুহু উঠল ধ্বনি পাখার মুখর তালি–
সন্ধ্যা হল, ভাঙলো সভা, মঞ্চখানি খালি।

বাংলাদেশের হৃদয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

ডান হাতে তোর খ ড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি–
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি!
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী–
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

দেশ

জসীমউদ্‌দীন

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঞ্চুতে জল ছিটায় সেথা কাল কাল কাক।
সাদা সাদা বক-কনেরা রচে সেথায় মালা,
শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা।
তারি মায়ায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া;
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরির দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি,
ডালের থেকে ডালের পরে ফিরছে পাখি টানি।
কচি কচি বনের পাতা কাঁপছে তারি সুরে
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে
মাথার পরে কালো কালো মেঘরলা এসে ভেড়ে
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।

নদীর পরে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ,
কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না জান দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়,
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ-নগর ছায়।
চখায় মুখর বালুর চরা হাসে কতই তীরে
ফুলের বনে রঙিন হয়ে যায় বা কভু ধীরে
দ্রুত মিনার-সৌধ চূড়ার কোল ঘেঁষিয়ে যায়
কত শহর হাট-বন্দর-বাজার ফেলে বায়।
কত নায়ের ভাটিয়ালির গানে উদাস হয়ে
নদীর পরে নদী চলে কোন অজানায় বয়ে।

আমার সন্তান

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া বক্ষে চলিলা পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিয়া আপনি ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।

দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

সুখের লাগিয়া

জ্ঞানদাস

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি কী মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল ॥

সময় গেলে সাধন হবে না

লালন শাহ

সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকিতে দিনের সাধন কেন করলে না ॥
জান না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কী হয় তার বাঁধন দিলে
শুকনা মোহনা ॥
অসময়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল তো ধরে না ॥

স্বাধীনতা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥

সাঁকোটা দুলছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে স্নিগ্ধ মনস্কাম।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিনদেশি।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে
এপারে শিশির পতনের নীরবতা।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা।

আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি-কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধু ধু
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।

খতিয়ান

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

হাত বাড়ালেই মুঠো ভ'রে যায় ঋণে,
অথচ আমার শস্যের মাঠ ভরা।
রোদ্দুর খুঁজে পাই না কখনো দিনে,
আলোতে ভাসায় রাতের বসুন্ধরা।

টোকা দিলে ঝরে পচা আঙুরের ঘাম,
ধস্ত তখন মগজের মাস্তুল,
নাবিকেরা ভোলে নিজেদের ডাক নাম
চোখ জুড়ে ফোটে রক্তজবার ফুল।

ডেকে ওঠো যদি স্মৃতিভেজা ম্লান স্বরে,
উড়াও নীরবে নিভৃত রুমালখানা।
পাখিরা ফিরবে পথ চিনে চিনে ঘরে,
আমারি কেবল থাকবে না পথ জানা–

টোকা দিলে ঝ'রে পড়বে পুরোনো ধুলো
চোখের কোনায় জমা এক ফোঁটা জল।
কার্পাশ ফেটে বাতাসে ভাসবে তুলো,
থাকবে না শুধু নিবেদিত তরুতল।

জাগবে না বনভূমির সিঁথানে চাঁদ,
বালির শরীরে সফেদ ফেনার ছোঁয়া
পড়বে না মনে, অমীমাংসিত ফাঁদ
অবিকল রবে রয়েছে যেমন শোয়া।

হাত বাড়ালেই মুঠো ভ'রে যায় প্রেমে,
অথচ আমার ব্যাপক বিরহ ভূমি।
ছুটে যেতে চাই– পথ যায় পায়ে থেমে,
ঢেকে দাও চোখ আঙুলের নোখে তুমি ॥

লাল গরুটা

সত্যেন সেন

লাল গরুটা বুড়ো হয়ে গেছে। দুধও দেয় না, কোনো কাজেও লাগে না। বাড়ির কর্তা নিধিরাম বলল, এটাকে রেখে আর কী হবে? দু চার টাকা যা পাই, তাতেই বিক্রি করে একটা দুধালো গাই কিনে নিয়ে আসাই ভালো। আমরা গবির মানুষ, আমরা কি আর বাজার থেকে দুধ কিনে খেতে পারি?

নিধিরামের বউ বলল, এমন কথা বলো না গো, অধর্ম হবে। আমার শাশুড়ির বড় আদরের ছিল গরুটা। বড় লক্ষ্মী আর শান্তস্বভাব, একটু ঢুঁ-ঢাঁও মারে না। এরকম গরু হয় না। এতকাল মায়ের মতো আমাদের দুধ খাইয়ে এসেছে, আর এখন কটা টাকার লোভে আমরা ওকে কসাইয়ের কাছে বেচে দেব?

না না, কসাইয়ের কাছে বেচব কেন ? নিধিরাম বলল, যারা চাষবাস করে খায়, এমন লোকের কাছেই বেচব।

নিধিরামের বউ চাষির ঘরের মেয়ে, সব খবরই রাখে। সে অবিশ্বাসের সুরে বলল, হ্যাঁঃ, ওকে দিয়ে কি আর চাষের কাজ চলবে ? বুড়ো হয়ে রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছে। দেখছ না হাড় কখানা মাত্র বাকি আছে। যেই ওকে কিনুক, দু দিন আগেই হোক আর পরেই হোক, কসাইয়ের কাছে বেচে দেবেই।

তবে করব কী ? নিধিরাম একটু গরম হয়েই বলল, এই অকম্মা গরুকে আর কতকাল বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব? যাদের টাকার জোর আছে, তারা তা পারে। আমাদের গরিব মানুষের কি আর সেই সাধ্য আছে?

নিধিরাম মিছে কথা বলে নি। কিন্তু তার বউ কিছুতেই সে কথা শুনতে চায় না। সে বলল, আমরাও একদিন বুড়ো হব, আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি তখন বলে, তোমরা বুড়ো হয়ে গেছ, কোনো কাজেই লাগে না। তোমাদের আমরা আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। তখন আমাদের কেমন লাগবে? আর আমরা যাবই-বা কোথায়? ছেলেমেয়েরা কথাটা জানতে পেরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। লাল গরুটাকে ছেড়ে তারা কিছুতেই পারবে না। বাড়িসুদ্ধ সব একদিকে আর নিধিরাম একদিকে। কিন্তু নিধিরামের গোঁ। বাধা পেলে তার জিদটা আরো বেড়ে ওঠে।

নিধিরামের পাঁচ বছরের ছেলে বিশু সটান দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল, আমার গরু। কাউকে বিক্কিরি করতে দেব না।

তোর গরু? তোর গরু আবার কেমন করে হলো ? নিধিরাম জিগ্যেস করল।

বিশু বলল, আমারই তো, আমি যে রোজ ওকে ঘাস খাওয়াই।

কিন্তু যে যতই বলুক না কেন, কারো কোনো কথা খাটল না। নিধিরাম লাল গরুটাকে মাত্র কুড়ি টাকায় বিক্রি করে দিল। দু-ক্রোশ দূরে সোনাকান্দা গ্রাম। সেখানকার একজন বুড়ো লোক তাকে কিনে নিয়ে গেল।

লাল গরুটার সাদা সরল মন। সে এতসব কিছু জানে না । ভাবতেও পারেনি। সারা জনম তার এই বাড়িতেই কেটে গেল। এ সব বেচাকেনার খবর সে রাখে না। যে মানুষগুলোকে সে এত ভালোবাসে, তারা যে তার সঙ্গে এমন করতে পারে, সে তা কেমন করে বুঝবে? ভাবল, একটা বুড়ো লোক তাকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। অবশ্য তার সঙ্গে ওর জানাশোনা নেই। নাই-বা থাকল। ওর ঘাস খাওয়া নিয়ে কথা। সে কোনো আপত্তি না করে দিব্যি তার পেছন পেছন চলে গেল। আর ঠিক সেই সময়টায় নিধিরামের বউ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এ কি চোখের সামনে দেখা যায়।

তারপর ফিরে এসে যখন শুনল লাল গরুকে নিয়ে গেছে, তখন বিশুর কি কান্না! ছেলেমেয়েদের সবার মুখই ভার। মায়ের অবস্থাও তাই। সেদিন বাড়ির কারোই ভালো করে খাওয়া হলো না। কিন্তু নিধিরামকে কেউ কিছু বললে না। কেউ কিছু বললে সে নিশ্চই খুব রেগেমেগে উঠত। রাগবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েও ছিল। কিন্তু কেউ তাকে সেই সুযোগ দিল না। নিধিরাম এমন বিপদে আর কখনো পড়েনি। কী আশ্চর্য, এমন যে তেজস্বী নিধিরাম, সে যেন ঠান্ডা জল হয়ে গেল। এর সাত-আট দিন বাদে এক অবাক কাণ্ড। বিকেলবেলা লাল গরুটা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। নিধিরাম উঠানের ধারে বসে বেড়া বাধঁছিল। আর এদিক ওদিক নয়, লাল গরুটা সোজা তার কাছে গিয়ে লম্বা মুখটা তার কাঁধের উপর তুলে দিল। ঠাণ্ডা নাকটা গায় লাগাতেই নিধিরাম চমকে উঠলো, এটা আবার কী? ওমা, এ-যে লাল গরুটা। অ্যাঁ, কেমন করে এসে পড়ল? লাল গরু তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি ওর মুখের দিকে তুলে ধরল। ওর চোখ দুটো যেন কথা বলছে। যেন বলছে, তোমার এ কেমন আক্কেল বল তো? আমাকে একা কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিলে? আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি? গরু তো মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না। কিন্তু মনে মনে সে এই কথাই বলছিল।

তারপর তাকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি, মাতামাতি, নাচানাচি শুরু করে দিল। বিশু লাল গরুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার গরু। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত লাল গরুর কথাই চলল। নিধিরাম কিন্তু মাথা নিচু করে চুপ করেই রইল। ভালোমন্দ কোন কথা বলল না।

কিন্তু এ আনন্দ যে বেশিক্ষণের জন্য নয়। পরদিন বেলাটা একটু উঠতেই সোনাকান্দা থেকে তিনজন লোক এসে হাজির। বুড়ো লোকটাও তাদের সঙ্গে আছে। ওরা পালিয়ে-যাওয়া গরুটার খোঁজে এসেছে। বিশু তার লাল গরুকে তখন ঘাস খাওয়াচ্ছিল। ওদের দেখেই গরুটার চোখে সে কী আতঙ্ক!

নিধিরাম সঙ্গে দু-একটা কথা বলে ওরা গরুটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সে কি যেতে চায়। চারটা পা খুঁটার মতো শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। গরুটি হয়তো মনে মনে আশা করেছিল, নিধিরাম ওকে এসে সাহায্য করবে। সেই আশায় সে হা করে ডেকে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। ওরা তিনজন আর সে একা। কতক্ষণ আর ওদের রুখবে। ওরা তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। লাল গরুটা ফিরে ফিরে পেছন দিকে তাকাচ্ছিল। সবাই পরিষ্কার দেখতে পেল, ওর বড় বড় চোখ দুটি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠল। ওদের মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় গুজল। আর নিধিরাম? নিধিরাম কী করল? সে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, গেলই, সারাদিন আর ফিরল না। নিধিরাম বউ গরুর চিন্তা ভুলে গিয়ে স্বামীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। বলা নেই, কওয়া নেই, গেল কোথায়? এমন তো কোনদিন করে না।

সন্ধ্যা লাগে লাগে ঠিক এমন সময় নিধিরামের বাড়িতে গত দিনের মতই হৈ হৈ পড়ে গেল। নিধিরাম ফিরে এসেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ সেই জন্যই কি? না, তা নয়। নিধিরাম লাল গরুটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।।

নিধিরামের বউ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, এ আবার কী? নিধিরাম ঝাঁঝাল সুরে উত্তর দিয়ে বলল, কী করব? তোমাদের জ্বালায় কি আর পারবার উপায় আছে? গরুটা ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। উলটো আরো দশটা টাকা গচ্চা লাগল।

গচ্চা লাগল কী রকম?

টাকা ফেরত দিতে গেলাম, আর ওরাও পেয়ে বসল। বলে, তোমার গরু আমাদের এই ক্ষতি করেছে, ঐ ক্ষতি করেছে। ক্ষতির এক লম্বা ফিরিস্তি দিল। কী আর করব, শেষ পর্যন্ত আরো বাড়তি দশটা টাকা আদায় করে ছাড়ল।

নিধিরামের বউয়ের চোখমুখ খুশিতে হেসে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হাসিটা চাপা দিয়ে সে বলল, বিক্রি করেছিলে করেছিলে, আবার কী দরকার ছিল ফিরিয়ে আনবার? সত্যি কথাই তো, এই অকম্মা গরুটাকে কী দরকার আমাদের?

নিধিরাম এবার হেসে ফেলল। বাবাকে হাসতে দেখে ছেলেমেয়েরাও সবাই তাকে ঘিরে ধরল। একদিন বাবার উপর মনে মনে কী-যে রাগ হয়েছিল তাদের। আজ সবার মন হালকা হয়ে গেছে। বাবাকে যত খারাপ মনে হয়, আসলে বাবা তত খারাপ নয়।

রাঁচি ভ্রমণ

এস. ওয়াজেদ আলি

ছুটি কোথায় কাটাব, তা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করে শেষে ঠিক করলুম, মোটরে করে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে একবার রাঁচি পর্যন্ত ঘুরে আসি। অভিজ্ঞ বন্ধুদের মত নিলুম। সকলেই আমাদের সংকল্পের তারিফ করলেন, আর সফরের বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের পরামর্শ দিতে লাগলেন।

৭ই অক্টোবর আমরা হাজারিবাগ ছেড়ে রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম।

পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের রাস্তা। স্থানে স্থানে পার্বত্য নদী এঁকেবেঁকে তার দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছে। দলে দলে রমণীরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলছে। সকলেরই মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব, সকলেই যেন কোনো উৎসবে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত।

কিছুক্ষণ পথ অতিক্রম করবার পর ব্যাপারটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দশহরা উপলক্ষে রাস্তার ধারের একটি বড় পুকুরের পাশে এক মেলা বসেছিল। সেই মেলা দেখবার জন্যই আশেপাশের গ্রাম থেকে এই লোকের আমদানি। মেলার নিকটে পৌঁছুতেই এক নাচের দল এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল, একরকম একতারা বাজাতে বাজাতে মৃদুগুঞ্জনে গাইতে আর ধীর পদক্ষেপে নাচতে লাগল।

রামগড়ের পর ১০/১২ মাইল পথ অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। রাস্তা হেয়ার-পিনের মতো এঁকেবঁকে উপরের দিকে উঠেছে। রাস্তার মুখেই একটি সাইন বোর্ডে লেখা আছে, 'রাস্তা বড় বিপদসঙ্কুল-মোটরের গতি পাঁচ মাইলের বেশি না হয়'। আমরা সকলে সাবধান হয়ে বসলুম। সমশের আলি পাহাড়ের পথ দিয়ে মোটর চালাতে সিদ্ধহস্ত। শিলংয়ের রাস্তায় সে যথেষ্ট মোটর চালিয়েছে। এখানে মোটর চালাবার ভার সে-ই গ্রহণ করল। অবিরামভাবে হর্ন বাজাতে বাজাতে এঁকেবেঁকে আমরা সেই পার্বত্য পথে আরোহণ করতে লাগলুম।

সৌন্দর্যের হিসাবে এই পথটা শিলং গৌহাটি রোডের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

একদিকে উচ্চ জঙ্গল-সমাকীর্ণ পাহাড়, আর অপর দিকে সুগভীর খাদ– তার পাদদেশে সুদূর সমতল ভুমি–তাকে বেষ্টিত করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য শৈলশ্রেণি। স্থানটি যেন প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র।

১২ মাইল অতিক্রম করবার পর আমরা অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছুলুম। দুর্ঘটনার আশঙ্কা তখন মন থেকে দূর হলো। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে মোটর চালিয়ে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে যখন আমরা রাঁচি প্রবেশ করলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার, ঝুরঝুর করে অবিরামভাবে বারিপাত হচ্ছে। অপরিচিত দেশ-সঙ্গে একজন মহিলা আর তিনটা শিশু– আমরা আশ্রয়ের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলুম। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ডাকবাংলোয় উপস্থিত হলুম। সেখানে একটা তিল রাখবারও স্থান নেই। খাবারের ঘরে লোক খাটিয়া বিছিয়ে শুয়ে আছে। সেখানকার দখলিস্বত্বের ভাগ্যবান অধিকারীরা যে দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে তাকে ঠিক স্নেহ-করুণা বলা যায় না।

রাঁচির বাজারে দেরামতুল্লা কোম্পানির বড় কারবার আছে। তারা আমাদের আত্মীয়। বাধ্য হয়ে শেষে আমাদের তাঁদেরই শরণাগত হতে হলো। ফার্মের ম্যানেজার মুনশি ইয়ার আলি দুই ঘন্টা আমাদের সাথে সমস্ত শহরটি তন্নতন্ন করে ঘুরলেন। একটা ঘর কোথাও পাওয়া গেল না। নিরাশ মনে আমরা রেলওয়ে স্টেশনে রাত্রিযাপনের সংকল্প করছি, এমন সময় সৎনারায়ণ তেওয়ারি নামক একজন ভদ্রলোক আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে আগ্রহের সহিত তিনি বলিলেন, তাঁর একটি বাড়ি খালি আছে, আমরা সেখানে যদি ২/৪ দিন কাটাই তাহলে নিজেকে তিনি বিশেষ অনুগৃহীত বলে মনে করবেন। তবে ভাড়া তিনি নেবেন না। এই অপুর্ব মেহমান-নওয়াজির জন্য তাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তারই আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

যে বাড়িটা তেওয়ারি মহাশয় আমাদের থাকবার জন্য দিলেন, সেটা প্রকাণ্ড একটি ইউরোপীয় ধরনের কুঠি। খুব আরামের সঙ্গেই সেখানে আমরা কাল কাটিয়েছিলুম।

সকালে আমরা শহর দেখতে বেরুলুম। রাঁচি হচ্ছে বিহার গবর্নমেন্টের গ্রীষ্মাবাস এবং সাঁওতাল পরগনার হেড কোয়ার্টারসমৃদ্ধ নগর। বড় বড় কুঠি, সুন্দর ছবির মতো রাস্তা, চারিদিকে পাহাড় আর প্রান্তরের শ্যামল শোভা।

রাঁচি শহরটা অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে অবস্থিত– তবে চারিদিকে পাহাড় স্থানটিকে বড় মনোরম করে রেখেছে। সেখানকার প্রধান একটি পাহাড়ের চূড়ায় একজন ভূতপূর্ব কমিশনার মন্দিরের আকারের একটি সুদৃশ্য মণ্ডপ বানিয়েছেন। সেখানে দাঁড়ালে সমস্ত শহরটি দেখা যায়। তিনিই Ranchi Lake নামক প্রকাণ্ড একটি কৃত্রিম হ্রদ এখানে খনন করিয়েছেন। Lake-টি দেখতে অতি সুন্দর– ঠিক স্বাভাবিক হ্রদের মতো। মাঝখানে একটি দ্বীপ Lake- এর শোভা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। Lake- এর উপকূলের মসজিদ, মন্দির, প্রভৃতি ধর্মায়তনগুলি স্থানটির প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে সুন্দর। আধ্যাত্মিক ভাব মিলিয়ে দিয়েছে।

'রাঁচির ফাঁকে' নামক অংশটি দেখতে বড় সুন্দর। এই অংশ দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী নিজের নামটি সার্থক করে নৃত্যশীল গতিতে, মৃদুগুঞ্জনে প্রেমের গীতি গাইতে গাইতে সুদূরের উদ্দেশ্যে চলেছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। তার মধ্যে একটি পাষাণের পাহাড় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলতার তাতে চিহ্নমাত্র নেই। যেন কোন উদ্যমহীন, আদর্শহীন সমাজের মধ্যে একজন অতিমানব দাঁড়িয়ে আছেন; অবজ্ঞার চক্ষে সকলকে দেখছেন, আর সমাজের কলুষ যাতে তাঁর মহত্ত্বকে স্পর্শ না করে তার জন্য কঠোরতার লৌহবর্মে নিজেকে আচ্ছাদিত করেছেন।

নদীর অনতিদূরে নাতি-উচ্চ একটি বিস্তীর্ণ ঢিপির উপর রাঁচির বিখ্যাত মানসিক হাসপাতাল এর উদ্যান পরিবেষ্ঠিত প্রাসাদোপম অট্টালিকারাজি বিরাজ করছে।

এই হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয়। স্থানটির পরিচ্ছন্নতা অতুলনীয়। একবার সেখানে গেলে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের অজস্র প্রশংসা না করে পারা যায় না। সুন্দর এবং প্রফুল্ল পারিপার্শ্বিকতা মানসিক ব্যাধি নিরাময়ে একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

একটি হলের মধ্যে দেখলুম অনেকগুলি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোক বসে আছে। প্রথমত আমাদের বড় আশঙ্কা হয়েছিল– যদি কেউ কোনো অনর্থের সৃষ্টি করে। আমরা ইতস্তত করছি। এমন সময় চিকিৎসাধীন একজন বর্ষীয়সী এসে আমাদের সাথে আলাপ আরম্ভ করলে সুষ্ঠু সংযত ভাষায়। তখন আমাদের ভয় ভাঙল।

স্ত্রীলোকটি তার করুণ কাহিনী আমাদের বলতে লাগলেন। আমাদের মতো তারও কলকাতাতেই বাড়ি। সেখানে তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরা সব আছে। তাদের দেখবার জন্য তার প্রাণ একান্তই ব্যাকুল। কলকাতায় ফিরে আমরা যেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না ভুলি। এই রকম সব কথা।

বৃদ্ধার কথা শুনতে শুনতে কেন যে তাকে এখানে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাই ভাবছি। এমন সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "দেখ, আমার গুলি-ডাণ্ডা খেলবার ভারি ঝোঁক। এখানে এরা কোনো মতেই আমায় গুলি-ডাণ্ডা খেলতে দেবে না। তোমরা দয়া করে আমার জন্য কলকাতা থেকে গুলি-ডাণ্ডা পাঠিয়ে দিতে পার?" বুঝলুম একজন মানসিক রোগীর সঙ্গে আমরা আলাপ করছি।

একটি ঘরে দেখলুম আশ্রম-বাসিনীরা সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত আছেন। তাদের শিল্প-নিপুণতার কতকগুলি সুন্দর নিদর্শনও সেখানে দেখতে পেলুম। একজন উচ্চশিক্ষিতা বাঙালি মহিলাকে সেখানে দেখে আমরা আশ্চর্য হলুম। সুন্দর নির্ভুল ইংরাজিতে তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর স্বামী একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী। নিয়তির নির্বন্ধে সুখের গৃহ-সংসার ছেড়ে এখানে তাঁকে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

আরও কয়েকটি আশ্রম-বাসিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইলুম। তাদের করুণ জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল।

রাঁচি শহর থেকে ১৫/১৬ মাইল সূরে 'উটরুং ফল' নামক একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। সুবর্ণরেখা নদীর জলধারা পার্বত্য জন্মভূমি ত্যাগ করে সেখানে আবেগভরা উল্লম্ফনে সমতল ভূমির ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা অতীব মনোরম।

গাড়ির রাস্তার শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের মোটর নিয়ে গেলুম। ১৫/২০ খানি মোটর সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাদের আরোহীরা ঝর্ণা দেখতে গেলেন। বন্ধুর পার্বত্য রাস্তা দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমরা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে দু-একজন গ্রাম্য লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলুম ঝর্ণাটি সেখান থেকে আরও ২/৩ মাইল দূরে অবস্থিত। পথ বন্ধুর এবং দুর্গম।

বেলা তখন দুটো বেজে গিয়েছিল। সেই সকাল থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি। সেখানে কোনো খাদ্য-দ্রব্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। ঝর্ণা দেখার সংকল্প ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে হলো। আমরা তাই করলুম। যাদের জন্য নিজেদের ঝর্ণা দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলুম সে ছেলেরাই কিন্তু ঝর্ণা না দেখে ঘরে ফিরতে হবে শুনে কান্না জুড়ে দিল।

মাল্যদান

রণেশ দাশগুপ্ত

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জয়ের পর ঘরে ফিরে এলো ঘরছাড়া মানুষ। দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল এক কোটি লোক। আর দেশের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছিল আরও এক কোটি। এবার সবার নিজের নিজের ঘরে ফেরার পালা। যারা ফিরে এলো তারা দেখল, যাদের রেখে গিয়েছিল, তাদের মধে অনেকে নেই।

হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও স্থানীয় আলবদর রাজাকাররা গ্রামের পর গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাসমেত অসংখ্য নর-নারী-শিশুকে নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা চরগুলোর বিরান এলাকায় জড়ো করে তারা খুন করেছিল। প্রায় প্রত্যেকটা মহকুমায় কয়েকটা করে বধ্যভূমি তৈরি হয়েছিল।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই এই বধ্যভূমিগুলোতে নিখোঁজদের চিহ্নের খোঁজ করা হলো। পরে এই বধ্যভূমিগুলো হলো শহিদভূমি।

যে ঘটনাটার কথা এখানে বলছি, সেটা এরকমের একটা বধ্যভূমি নিয়ে_স্বাধীনতার পরের বছরের ঘটনা। ঝালকাঠিতে একটা ছাত্রসম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন ঢাকা থেকে অধ্যাপক কামাল। প্রধান অতিথি হিসেবে। স্টিমারে লম্বা পথ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক কামাল স্টেনগান কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং ছিলেন ধলেশ্বরীর ধার ঘেঁষে এক গণ্ডগ্রামে। মাঝে মাঝে লঞ্চ নিয়ে দখলদার বাহিনীর লোকেরা গঞ্জে গঞ্জে হানা দিত। তাদের সঙ্গে দু একটা খণ্ডযু করেছিলেন তিনি। কলেজ ও [illegible]লের কয়েকটি ছেলেকে দখলদার বাহিনীর লঞ্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝাঁককে ঠকিয়ে রাখতে হয়েছে তাঁকে। এক ঝাঁক ছেলে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ছোট দলটিকে সাহায্য করত। দরকার হলে নৌকা বাইত। এদের সবাইকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন গ্রাম এলাকায় একটা সংসারের মতো পেতেছিলেন তিনি। নতুন সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা করতেন। বই পড়াতেন।

ঝালকাঠি যাওয়ার সময় স্টিমারের ডেকে লম্বা নদীপথে দাঁড়িয়ে দূর-দূরান্তের দৃশ্য দেখছিলেন অধ্যাপক কামাল_গাছপালায় ঢাকা অসংখ[illegible]গ্রামকে দেখে কল্পনার চোখে তাঁর মনে হচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনটা খুব দীর্ঘ। ধলেশ্বরীর কিনারা থেকে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এবার ফিরে গিয়ে রণাঙ্গনের বিস্তৃতির ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাবে গ্রামের

সবাইকে। এমনকি ঢাকাতেও বলা যাবে। ছেলেমেয়েরা কোথায় কী করেছে তার একটা হিসাব পেশ করা যাবে।

ঝালকাঠি সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা বন্দর। এখানে একটা কলেজ আছে। খুলনা আর বরিশালের যোগসূত্র এখানে। ছাত্র-আন্দোলনে নাম আছে। নদীর ধারের কলেজে নদীর কোলে আশৈশব লালিত ছেলেদের গুঞ্জনে ঝড়ো ঢেউ ওঠে। উর্মিলতাও রয়েছে। হাজার খানেক তরুণ-তরুণীর সপে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন অধ্যাপক কামাল।

গভীর রাতে জেটিতে স্টিমার ঠেকলে সিঁড়ি লাগানোর পরে ছাত্ররা তাঁকে প্রায় শূন্যে তুলে নামাল। তাদের ধারণা, ঢাকার অধ্যাপক আর বুদ্ধিজীবীরা ঝালকাঠিকে গেঁয়ো মনে করে। স্টিমারটার ব্যবহারও অনেকটা নৌকার মতো। ওঠানামা করার সমস্ত দায়িত্ব যাত্রীদের।

সুতরাং সেই রাতে অধ্যাপক কামাল ঝালকাঠির আর কিছু দেখতে পেলেন না।

সকাল আটটায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হলো তাঁকে। একটি ছোট বক্তৃতা করলেন। এরপরে ছাত্রছাত্রীরা সবাই লাইন করে দাঁড়াল। অধ্যাপক কামালকে লাইনের মাথায় গিয়ে দাঁড়াতে হলো।

একটি ছেলে বিনীতভাবে বললো, 'স্যার, এখন আমরা বধ্যভূমিতে যাবো। সেখানে একটি সৃতিফলক আছে, তাতে আপনি মালা দেবেন।' মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী লঞ্চ থেকে বন্দরে হানা দিত, যাকে সামনে পেত, পুরুষ-মেয়ে ও শিশু নির্বিশেষে ধরে নিয়ে এই বধ্যভূমিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারত। বিজয়ের পর কঙ্কাল আর খুলির মধ্যে পাগলের মতো বন্দরের মানুষ তাদের আপনজনকে খুঁজেছে। নিয়েও গিয়েছে অনেকে আন্দাজ করে মাথার খুলি। আজ একেবারে পরিষ্কার।

ঝালকাঠি বন্দরটাকে প্রায় সর্বাংশে পেরিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে অধ্যাপক কামাল গিয়ে পৌঁছলেন বধ্যভূমিতে। দেখলেন সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা চর। হু-হু হাওয়া, এরই ধার ঘেঁষে ইট দিয়ে বাঁধানো উঁচু বেদি। বদির ওপর শ্বেতপাথরের ফলক। তাতে শহিদদের উদ্দেশে একটা লেখন। সংক্ষিপ্ত লেখা, কিন্তু তীক্ষ্ম।

অধ্যাপক কামালকে এই উঁচু ছিমছাম বেদিটির পাঁশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হলো। খানিকটা দূরে দীর্ঘ মিছিল দাঁড়িয়ে রয়েছে। অধ্যাপক কামাল ধলেশ্বরীর ধারের বাসিন্দা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বললেন। বললেন, ঝালকাঠির বাসিন্দা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। বধ্যভূমির ওপর দিয়ে তখন বয়ে চলেছে উদ্দাম বাতাস। অধ্যাপক কামালের কথাগুলোকে সেই বাতাস যেন লুফে লুফে নিয়ে যাচ্ছিল।

এরপরেই মালা দেবার পালা। অধ্যাপক কামাল দুটি মালা দুই হাতে উঁচুতে তুলে সমবেত জনতাকে দেখালেন। তারপর মালা দুটি স্মৃতিফলকের ওপর রাখলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এসে এক ঝটকায় মালা দুটিকে ফেলে দিল। আবার রাখতে গেলেন। আবারও ব্যর্থ হলেন। মালা দুটিকে স্মৃতিফলকের কোথাও গোঁজার উপায় ছিল না।

অধ্যাপক কামাল দুটো ইট আনতে বললেন, মালা দুটি চাপা দিতে। সেই শূন্য প্রান্তরের মতো বধ্যভূমির চরের, জোর হাওয়ায় ভারি জিনিস না হলে মালা রাখা যাবে না একথা জানালেন। একটি ছেলে চরের খোঁজাখুঁজি করতে করতে, হঠাৎ এসে দাঁড়াল অধ্যাপকের সামনে। তার হাত দুটি পেছন দিকে।

স্যার।–

বলো।–

পেয়েছি চাপা দেবার জিনিশ। কিন্তু এগুলো যে মাথার খুলি।–

অধ্যাপকের বিস্মিত চোখের সামনে তুলে ধরল সে মাথার খুলি দুটি। নিজেকে সামলে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'আশ্চর্য। যাঁদের মালা দেওয়া হচ্ছে তাদেরই হয়ে দুজন কি তোমার হাতে উঠে এসেছে। কিন্তু এঁদের নিশ্চয়ই নাম ছিল। কী নাম?' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি খুলি দুটো তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'এদের একজনের নাম যেন পারুল, আরেকজনের নাম সিতারা। পারুল আর সিতারার জন্য রইল মালা।'

তারপর অধ্যাপক কামাল ঐ দুটি মাথার খুলি দিয়েই মালা দুটি চাপা দিলেন সেই স্মৃতিফলকের ওপর। মালা দুটিকে দেখে মনে হলো, মালা গলায় পারুল আর সিতারা বেদির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক চলে এলেন মিছিলের মাথায়–কাউকে আর কিছু খুলে বললেন না। বধ্যভূমিতে যাদের প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাদের নিকট-আত্মীয়রা দ্বিধায় পড়বেন এই খুলি নিয়ে। তার চেয়ে বরং সকলের তরফ থেকে মালা দিয়ে তাঁদেরকে স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রাখা যাক।

বাঙালির বাংলা

কাজী নজরুল ইসলাম

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ার কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি এবেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয় বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজোগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্র-শক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগলো না বলে দিব্যশক্তি কোন কাজে লাগলো না– বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদগিরণ করলো না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষেই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্বগুণের প্রধান শত্রু তমোগুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, ব্যাধিতে, অভাবে, দৈন্যে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈব-শক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদ-গুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলা বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য-প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য-

উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ– আল্লাহ, ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনও ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, বাঙালির বাংলা নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উলটো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্নও রাখতে চেষ্টা করছে। আজ বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র ফকির-দরবেশ ওলি-গাজির দর্গা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর, বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নীরব বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধি হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রু। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র সৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, মায়াময় অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে,– হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য– যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি ক্ষাত্রশক্তিকে অবহেলা করল বলে তার এই দুগর্তি তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা– তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য। খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস

করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে– তাকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় দিয়ে বিনাশ করব, সংহার করব।

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও:

এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির-আমাদের।
দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়
তাড়াবো আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
রামাদের গামাদের।

বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক।

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়েছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই-এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়েছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে-চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্বত প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন ইন্‌ল্যান্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানির ডাকগাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রানিগগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ি থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিল। 'সাহেব একটি পয়সা, সাহেব একটি পয়সা।' এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

তাহাদের সঙ্গে একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশুও আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ি অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া– যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহা আর আশ্চর্য কী?

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে

গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা যাইবেন?' আমি বলিলাম, 'একবার এই পর্বতে যাইব।' সে হাসিয়া বলিল, 'পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।'

আমি এ-কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করিলাম না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব, গাড়ওয়ানের নিষেধ না-শুনিয়া আমি পবর্তাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্বত পূর্বমতো সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুন পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোনো সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসীর বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে।

যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তথায় গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহারা অভিবাদন আমি সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা'। সেখানে তিন শত লোক থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিল যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিকের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর-একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, 'চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় থাকেন।' এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র ছাত্রদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর-একঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ব মর্তমান রম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে! লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে: কিন্তু আমি তাহা কোনোরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে 'কলাকাঁদির হিসাব' দেখিয়া বরং আরো চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি।

আমি ভাবিয়াছিলাম পালামৌ প্রবল শহর, সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।

সেখানে একবার একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে। তাহার একস্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণি দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বন বর্ণনায় যেরুপ 'শাল তাল তমাল, হিন্তাল' শুনিয়াছিলাম,

সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তা, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশি কদম্ববৃক্ষের মতো, না হয় কিছু বড়; কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, এই জন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরো যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

অল্প বিলম্বেই অর্ধশুস্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে-সেখানে দুই-একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে-প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সে-প্রান্তর আরো রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনো দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকির পরিবর্তে এক-একখানি গোল আরশি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহবা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

এই অঞ্চলে প্রধানত কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না! যে-সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ-বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটির। আমার পালকি দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো। কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঙ্গালারা পথেঘাটে বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য কৃষিকার্য সকল কার্যই তাহারা করে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখনো কখনো চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ

হইয়া যায়, স্ত্রী লোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে। লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রী জাতিরাই বলিষ্ঠ ও আশ্চর্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে।

একদিনের কথা বলি। যেরূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে।

যখন আমি নিকটবর্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, 'আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন মুখে আর জল গ্রহণ করি?' আমি কিঞ্চিত অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, 'চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।'

আমি স্বভাবত বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুক সমন্ধে আমার কখনো ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারিরা কতদিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনো গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম, বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনো আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনো বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবারি তাহার অঙ্গ প্রবিষ্ট হইবে এ-কথা তাহাদের মনে আইসে না। যতদিন তাহাদের মনে এ-কথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসী। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপ দেখা যায়, সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভালো হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়।

একদিন অপরাহ্নে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলো কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

তাহাদের মধ্যে যে- সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা- মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, 'রাত্র নাচ দেখিতে আসিবেন?' আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয়

পৃথিবীর আর কোনো জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা 'খোঁপা' বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই-তিনখানি কাঠের 'চিরুনি' সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহবা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্ত হস্তে কেহ আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানাভঙ্গিতে আপন আপন বলবীর্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়-মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশা-বারোটা, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলন্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো। সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল।

বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; পরে তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নতুন, তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না; টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর এক বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিত কণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চস্বরে গাহিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে 'ধুনা' ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেইসঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি-একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে, দুই-তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্তকীদের বর্ণ আরো কালো দেখাইতেছে, তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে একবার 'চিতিয়া' পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাম্প্রদায়িক
পাঠ্যবই
বাতিল করে

শিশু কিশোরদের
সুন্দর আগামী
ফিরিয়ে দাও